রাক্ষস নয় দেবতা

হাসান ফেরদৌস

মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার *মেঘনাদবধকাব্য* লিখে শেষ করেন ১৮৬১ সালে, ঠিক যে বছর রবীন্দ্রনাথের জন্ম। তার এই মহাকাব্য নিয়ে মাইকেল নিজে খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। নিজের সাফল্যকে মিলটনের সমতুল্য না হলেও কালিদাসের কম যায় না বলে ভাবাতে শুরু করেছিলেন তিনি। সন্দেহ নেই, প্রকাশের পরপর যে জনপ্রিয়তায় গ্রন্থটি অভিষিক্ত হয়েছিল, তার আত্মতুষ্টির সেটি একটি কারণ। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সে সময় সহর্ষে মন্তব্য করেছিলেন, এই কবি বাঙালি পাঠকের মনে চিরকালের জন্য স্থান করে নেবেন।

নিজের সমসাময়িক কবি-সমালোচকদের হাতে বন্দিত হলেও পরবর্তী প্রজন্মের প্রধান কবিদের হাতে এই কাব্যের জন্য মাইকেলের ভাগ্যে স্তুতির বরমাল্য জোটেনি। রবীন্দ্রনাথ অনতিতরুণ বয়সে লেখা এক প্রবন্ধে *মেঘনাদবধকাব্য*কে এককথায় বাজে বলে বাতিল করে দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থ পাঁচ জায়গা থেকে টুকে লেখা, তার না আছে প্রাণ, না আছে কাব্যমাধুর্য। পরে, পরিণত বয়সে, নিজের সে বক্তব্য তিনি সংশোধন করেছিলেন বটে, কিন্তু তার সে কথা, অনেকের ধারণায়, অগ্রজ কবির প্রতি বিনয়বোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। অ্যাডওয়ার্ড থমসনের কাছে লেখা এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ *মেঘনাদে*র ব্যাপারে যে মন্তব্য করেন তাতে বিশ্বকবির তরুণ বয়সের মনোভাবেরই অবিকল প্রকাশ ধরা পড়ে। সে পত্রে মাইকেলের কাব্যপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে কবিগুরু বলেছিলেন, এই কবি একটা অভিধান এনে তা থেকে গুরুগম্ভীর শব্দ খুঁজে খুঁজে তা জুড়ে দিয়ে কবিতা লিখেছেন। হয়তো তিনি অনেক শক্তিধর কবি, কিন্তু তার কাব্য আর যাই হোক বাংলা নয়।

*মেঘনাদবধকাব্যে*র প্রতি সবচেয়ে নির্মম সমালোচনা করেছেন সম্ভবত বুদ্ধদেব বসু। মাইকেল বাংলা জানেন না এমন একটা অভিযোগ এনে প্রমাণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তিনি। *মেঘনাদবধকাব্য* তার কাছেও নিষ্প্রাণ ও কৃত্রিম বোধ হয়েছে। এতে আয়োজনের, আড়ম্বরের অভাব নেই, সাজসজ্জার ঘটাও খুব, কিন্তু সমস্ত জিনিসটাই আগাগোড়া মৃত। তার সমসাময়িক আরেক কবি সুধীন দত্ত, তিনিও মাইকেলকে অপাঠ্য বলে বাতিল করে দিয়েছেন। একমাত্র বিষ্ণু-দে-ই মাইকেলের প্রতি কিঞ্চিৎ উদারতা দেখিয়ে বলেছেন, মাতৃভাষার সেমান্টিকত্বে তার কর্তৃত্ব না থাকলেও তার স্নায়ুতে ছিল ভাষার কথনছন্দ। মাইকেলের কাব্যকীর্তি অসম হলেও তার মানসে কবিতা ভর করেছিল।

মেঘনাদবধকাব্য রচনার প্রায় দেড় শ বছর পর, তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথমপাদে, সে কাব্যকে এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন ক্লিনটন সিলি। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক সিলি অবাঙালি, কিন্তু তাই বলে তিনি বাঙালি নন, এ কথা বলতে আমার প্রবল আপত্তি আছে। তিনি শুধু ভালো বাংলা বলেন ও লেখেন না, তার মতো মেধা, অধ্যবসায় ও শ্রম দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে বোঝা ও তাকে বোঝানোর চেষ্টা খুব বেশি বাঙালি লেখক-বুদ্ধিজীবী এখন করছেন বলে মনে হয় না। জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে লেখা তার গ্রন্থ *এ পোয়েট অ্যাপার্ট* সে কথার প্রমাণবহ।

*মেঘনাদবধকাব্যে*র ইংরেজি অনুবাদ অধ্যাপক সিলির ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে পরিশ্রমের ফল। ছাত্র পড়াতে গিয়ে কাব্যগ্রন্থটির প্রতি তিনি আগ্রহী হন, ক্রমশ সে কাব্যের বহিরঙ্গ পেরিয়ে তার অন্তর্জগতে ঢুকে পড়েন। আর বেরিয়ে আসতে পারেননি। প্রায় তিন দশক সাধনার পর নির্মিত এই গ্রন্থের ভেতর দিয়ে সম্মানের যে বরমাল্য তিনি মাইকেলকে তুলে দিয়েছেন, কোনো স্বদেশবাসীর কাছ থেকেও মধুকবি তা কখনো পাননি। নিজে আশৈশব শ্বেতদ্বীপের স্বপ্ন দেখেছেন মাইকেল, ইংরেজি ভাষায় মিলটনের মতো কবিতা লিখবেন বলে প্রস্তুতি নিয়েছেন। কিন্তু মনের মধ্যে, অবচেতনে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি, বিশেষ করে তার গৌরবময় পুরাণকথার জন্য তার যে আকুতি

(মাইকেলের কথায় : 'দি গ্রান্ড মিথলজি অব আওয়ার অ্যানচেস্টরস' তা কখনো অবলুপ্ত হয়নি। আমাদের এই প্রথম কসমোপলিটন বাঙালি কবি পূর্ব ও পশ্চিমকে একত্র করে যে সাহিত্য সৃষ্টি করলেন, তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের দায়িত্ব নিলেন এমন একজন, যার ভাষা ইংরেজি, অথচ মনের টানে যিনি পুরোপুরি বাঙালি। সে অর্থে মাইকেল ও সিলি একে অপরের আয়নায় প্রতিফলিত ছবি। এই ক্লিনটন সিলিই যে মাইকেলের কাব্য বাংলায় অনুবাদ করে বিশ্বসভায় হাজির করবেন, তাতে বিস্ময়ের কী থাকতে পারে!

দি স্লেইং অব মেঘনাদ প্রকৃতপক্ষে একসঙ্গে দুটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। প্রথমটি সে কাব্যগন্থের অনুবাদ, অপরটি মাইকেল ও তার *মেঘনাদবধকাব্য* নিয়ে একটি গবেষণাগ্রন্থ। *মেধনাদবধকাব্য* রচনার পটভূমি বিচার করতে গিয়ে অধ্যাপক সিলি বেঙ্গল রেনেসাঁর ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতটি ব্যাখ্যা করে যে দীর্ঘ ভূমিকা এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে ধীমান ছাত্রটিও তা থেকে উপকৃত হবেন, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। মাইকেলের মেঘনাদকে পুরোপুরি বুঝতে হলে তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতটি বোঝা খুবই জরুরি। কারণ, মানুষ হিসেবে মাইকেল এবং কাব্য হিসেবে *মেঘনাদ* একই সঙ্গে ভারতীয় ও ইউরোপীয়। মধ্য-উনিশ শতকে যে কসমোপলিটন সংস্কৃতি ভারতে, বিশেষ করে বাংলায় বিস্তার লাভ করে, মাইকেল ও তার কাব্য সেই শঙ্কর সংস্কৃতিরই প্রতিনিধি। রবীন্দ্রনাথ বা বুদ্ধদেব যে শঙ্কর প্রবৃত্তির জন্য মাইকেলকে উপহাস করেন, যে কারণে প্রমথ চৌধুরী তার কাব্যকর্মকে বিদেশী অনুকরণ বলে তা বাতিল করে দেন, সিলি সেখানে তার মৌলিকত্ব আবিষ্কার করে বিস্মিত হন। হোমারের *ইলিয়াদ,* দান্তের *ইনফারনো* বা মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট যে মাইকেলকে প্রভাবিত করেনি তা নয়, কিন্তু ইউরোপীয় উপাদানকে দুমড়ে-মুচড়ে তাকে একদম নতুন রূপ দিয়েছেন মাইকেল, আর সে রূপ পুরোপুরি ভারতীয়। উদাহরণস্বরূপ অধ্যাপক সিলি পিতা দশরথের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নরকের পথ ধরে রামের মৃত্যুপুরীতে আগমনের কথা স্মরণ করেছেন। *মেঘনাদবধে* যে নরকের বর্ণনা তা মোটেই *ইনিদ* বা *ইনফারনো* থেকে ধার করা নয়, তা পুরোপুরি বাংলা *মহাভারত* থেকে অনুসরণ করে নির্মিত। তাতে নরকের চার ফটক ও ৮৪ অগ্নিকুণ্ডের কথা উল্লেখ করতেও ভোলেন না মাইকেল। একইভাবে মেঘনাদের স্ত্রী প্রমীলার চরিত্রে কেউ কেউ তাসোর আরমিদা বা ভার্জিলের কামিলার ছায়া দেখেছেন। কিন্তু সিলির বিবেচনায় মাইকেলের জন্য প্রমীলার আসল উৎস ছিল *মহাভারত*। *রামায়ণে* প্রমীলা নেই, সপ্তদশ শতকে কাশীরাম দাসকৃত বাংলা *মহাভারত* ও অন্যান্য ভারতীয় সূত্র থেকেই মাইকেল তাকে সংগ্রহ করেছেন। তার হাতে প্রমীলা কখনো প্রিয়তমা স্ত্রী, কখনো যোদ্ধা রমণী, কখনো বা বৈধব্যপীড়িত সতী। সিলির দাবি, মাইকেলের লক্ষ্য অন্য আর কিছু নয়, তিনি একজন আদর্শ ভারতীয় রমণী নির্মাণেরই চেষ্টা করেছেন। *মেঘনাদবধকাব্যে ইলিয়াদ* থেকে তিনি যে ধার করেছেন, সে কথা খোদ মাইকেলই স্বীকার করেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেছেন, তার লক্ষ্য গ্রিক থেকে কাহিনী চুরি করা নয়, বরং একজন গ্রীক-তার ক্ষেত্রে হোমার যেভাবে মহাকাব্য লেখেন, কেবল সেই লেখন পদ্ধতির অনুসরণ। তার গল্প, অ্যাজ থ্রো এ হিন্দু অ্যাজ পসিবল অধ্যাপক সিলি মাইকেলের এ কথা নানাভাবে প্রমাণিত করেছেন।

মেঘনাদবধকাব্যের খ্যাতি ও বিড়ম্বনার অন্যতম কারণ এতে *রামায়ণে* বর্ণিত রাম-রাবণ চরিত্রের 'রোল-রিভারসাল'। রামায়ণের প্রধান চরিত্র রাম, তিনি দেবতা, তিনি নায়ক। কিন্তু *মেঘনাদবধকাব্যের* নায়ক রাবণ ও তার পুত্র মেঘনাদ। *প্যারাডাইস লস্টে* মিলটন যেমন স্পষ্টতই শয়তানের প্রতি সদয়চিত্ত, মেঘনাদবধেও মাইকেল দেবতার বদলে অসুরের পক্ষাবলম্বী। মাইকেল নিজেই বন্ধু রাজশেখর বসুকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আই ডিসপাইজ রাম অ্যান্ড হিজ র‍্যাব্‌ল, হোয়াইল দ্য আইডিয়া অব রাবণ এলিফ্যাটস অ্যান্ড কাইন্ডলি মাই ইমাজিনেশন'। রাম-রাবণের এই ভূমিকা পরিবর্তনে মাইকেল যেখানে মহাকাব্যের সম্ভাবনা দেখেন, ভারতীয়

পাঠক সেখানে দেখতে পান ইচ্ছাকৃত বিকৃতি। তরুণ রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই 'রোল-রিভারসাল' সদয় চোখে দেখেননি। তার কথায়, রামের প্রতি যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে, মাইকেল তার ভেতর দিয়েই প্রমাণ করলেন 'তিনি মহাকাব্য রচনার যোগ্য কবি নহেন। মহত্ব দেখিয়া তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হয় না। নহিলে তিনি কোন প্রাণে রামকে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা ভীরু ও লক্ষ্মণকে চোরের অপেক্ষা হীন করিতে পারিলেন।' কিন্তু অধ্যাপক সিলি বাংলা কৃত্তিবাসী *রামায়ণ* অনুসরণ করে দেখিয়েছেন, মাইকেল তার কাব্যে প্রকৃতপক্ষে রাম ও রাবণের চরিত্র মোটেই পালটে দেননি। প্রমাণ হিসেবে তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের মৃত্যুতে রামের বিলাপ অংশ কৃত্তিবাসী *রামায়ণ* এবং *মেঘনাদবধকাব্য* থেকে সমান্তরাল উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, উভয় রচনার সাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট। উভয় ক্ষেত্রেই রাম বিলাপরত। *মেঘনাদবধকাব্যে* তাকে যদি সে কারণে দুর্বলচিত্ত মনে হয়, তাহলে কৃত্তিবাসে তিনি যে কঠিন হৃদয়, তা মোটেই নয়। আবার পুত্রের মৃত্যুতে রাবণের বিলাপ, তাও কৃত্তিবাসী *রামায়ণ* থেকেও আলাদা কিছু নয়।

তা সত্ত্বেও অধিকাংশ পাঠক যে রামকে দুর্বলচিত্ত ও রাবণকে বীরোচিত ভাবেন, তার কারণ সিলির ব্যাখ্যায়, এই কাব্যে মাইকেলের 'subversive similes'-এর চতুর ব্যবহার। (অধ্যাপক সিলির কাছে আমি subversive similes-এর বাংলা পরিভাষা কী হবে তা জানতে চেয়েছিলাম। তিনি তিন-চারটে সম্ভাবনার কথা বলেছেন, যেমন, উপমায় উল্টানো উপমা, ভুলানো উপমা বা অপ্রত্যাশিত উপমার উপমা।) সিলি ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন, অন্য সকল উপমার মতো উল্টানো বা বিপরীত উপমাও অলঙ্করণেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কখনো কখনো তা অসম্পৃক্ত ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে সংযুক্তি নির্মাণের মাধ্যমে তার সঙ্গে সাদৃশ্য বা তুলনা আহ্বান করার কাজেও ব্যবহার করা যায়। যে বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে তার কোনো সম্পৃক্তি নেই, এ জাতীয় উপমা ব্যবহারের মাধ্যমে তার সঙ্গে যে সম্পর্ক নির্মিত হয় তার একটি প্রধান লক্ষ্য এই দুইয়ের মধ্যে নৈকট্য বা ব্যবধান চিহ্নিত করা।

অধ্যাপক সিলি *মেঘনাদবধকাব্য* থেকে বিস্তর উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন এই subversive similes ব্যবহারের ভেতর দিয়ে মাইকেল কীভাবে তার পাঠককে বিভ্রান্ত করেছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি প্রথম সর্গে রাবণের রাজসভাকক্ষের নিম্নোক্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন :

...ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর রূপে!
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মরতি,
পাণ্ডব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি! মন্দে মন্দে ভয়ে গন্ধে বহি,
অনন্ত বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে রঙ্গে আনি
কাকলী লহরী, মরা! মনোহর, যথা
বাঁশরীস্বরলহরী গোকুল বিপিনে!
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরব?

The umbrella-bearer held the parasol;
ah, just as Kama might have stood in Haras angers

flame,
unburned, so he stood on the floor of that assembly hall,
as bearer of the royal parasol. Before its doors
paced the guard, a redoubtable figure, like god Rudra,
trident clutched, before the Pandavas encampments gateway!
Constant spring breezes delicately wafted scents, gaily
transporting waves of chirping, ah yes! enchanting as the
flutes's melodic undulations in the pleasure groves of
Gokula! Compared to such an edifice, O Maya,
Danava lord, how palty was that jeweled court built at
1Indraprastha with your own hands to please the Pauravas.

বিপরীত উপমার ব্যবহারের ব্যাখ্যা হিসেবে অধ্যাপক সিলি লিখেছেন, কবি বলছেন না যে কাম রাবণের ছত্রধারী, সে কথা বললে রাবণকেই শিব বলা হবে। অথবা রাবণের রাজকক্ষ ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের সভাকক্ষ, সে কথা বললে রাবণকে যুধিষ্ঠির বলা হবে। অথবা তিনি এ কথাও বলছেন না যে, রাবণের প্রাসাদ-নিকটবর্তী যে কুন্দ-কানন তা কৃষ্ণের লীলাভূমি। কবি শুধু বলছেন রাজকক্ষটি খুবই সুন্দর। এসব উপমা ব্যবহারের ফলে তার চিত্রিত দৃশ্য আরো মনোহর হয়েছে। কিন্তু যত পরোক্ষই হোক না কেন, বিপরীত উপমা ব্যবহারের ফলে রাবণকে শিব, কৃষ্ণ এবং পঞ্চপাণ্ডবদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়েছে। রাবণকে মহীয়ান করা কবির লক্ষ্য নয়, তার লক্ষ্য রামের বদলে রাবণকে দেবতাদের সঙ্গে সংযুক্ত করা।

আমাকে লেখা এক পত্রে অধ্যাপক সিলি বিষয়টি আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তার কথায় : 'তুমি পাঠক হিসেবে ভাবছো যাকে শিব বা পাণ্ডবদের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে, সে নিশ্চয় ভালো লোক।' পাঠক হিসেবে তোমার পক্ষে এ কথা ভাবা খুবই স্বাভাবিক যে, একজন ভারতীয় কবি রামকেই এসব 'ভালো লোক'দের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে দেখাবেন। কিন্তু এখানে কবি তা না করে শিব ও পাণ্ডবদের সঙ্গে তুলনীয় করে রাবণকেই মহান করে তুলেছেন। মাইকেল বলছেন না রাবণ রামের চেয়ে উত্তম, কিন্তু তিনি রামকে শিবের সঙ্গে তুলনা না করে রাবণকে শিবের সঙ্গে তুলনা করছেন। এভাবে তিনি পাঠকের প্রত্যাশাকে 'বিপর্যস্ত' করে ফেলেছেন। এই কাব্য পাঠের ফলে পাঠকের মনে এই বোধ জন্মায় যে, কবি বুঝি রামকে উপেক্ষা করে রাবণকে শ্রেয়তর করে তুললেন। কিন্তু আসলে তিনি শুধু চাতুর্যের সঙ্গে রাবণকে দেবতাদের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। তার এই কাব্যিক চাতুর্যের ফলে পাঠক ধাঁধায় পড়ে যায়, যদিও তার মনে যে বোধ জন্ম নেয় কবি নিজে কখনো তা সরাসরি বলেন না। সিলি জানিয়েছেন, একবার নয়, বহুবার এই চালাকির উদাহরণ রয়েছে *মেঘনাদবধকাব্যে*।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, কারিগরিশৈলীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে সত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সিলি করেছেন, সে পথে না গিয়ে কেবল মাইকেলের বাণীকে অনুসরণ করে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তার কথায়, *মেঘনাদবধকাব্যে* রাবণের প্রতি মাইকেলের পক্ষপাত কেবল বচনের দ্বারা, রচনার দ্বারা নয়। এই কাব্যের পদে পদে দেখা যায় যে, রাম-সীতার লোকশ্রুত মহিমায় কবি অভিভূত এবং রাবণের দুশ্চরিত্রতার ধারণাও তার মনে বদ্ধমূল। 'তাই যদি না হতো তাহলে ওই সুদীর্ঘ কাব্যে এই অদ্ভুত রহস্যময় প্রশ্ন উত্তাপিত না হয়েই পারত না যে রাবণ সীতাকে হরণ করেছিল কেন। সম্ভোগের জন্য? কিন্তু সম্ভোগ কোথায়? সীতাকে লঙ্কায় নিয়ে এসেই রাবণ যে

তাকে একাকিনী অশোক কাননে রেখে দিলেন, রাবণ চরিত্রের এই মৌল দ্বন্দ্ব কারো চোখেই ধরা পড়েনি, যত দিন না রবীন্দ্রনাথ সন্দীপের মুখ দিয়ে কথাটা বলিয়েছিলেন।' সিলি লোকশ্রুত পৌরাণিকতায় মাইকেলের মুগ্ধতার কথা বলেছেন; *মেঘনাদবধকাব্যে* লিবিডোর ভূমিকাও বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করেছেন, কিন্তু কোথাও রাম-রাবণের প্রশ্নটি এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেননি।

তবে অন্য যে জিনিসটি সিলির পাঠে নতুনভাবে ধরা পড়েছে তা হলো পুত্র হিসেবে রাম ও মেঘনাদের তুলনা এবং সে তুলনায় খোদ মাইকেলের সম্পৃক্তি। অধ্যাপক সিলি রাম ও মেঘনাদকে দায়িত্ববান পুত্র হিসেবে কে কেমন তার তুলনা করেছেন। আপাতভাবে, তারা উভয়েই পিতার প্রতি কর্তব্য পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ত্যাগে ব্রতী। রাম পিতার নির্দেশ শিরোধার্য করে বনবাসে এসেছেন। কিন্তু কামচেতনায় প্ররোচিত হয়ে দশরথপুত্রের প্রতি যে অবিচার করেন, তার বেদনা থেকে তিনি নিজে নিষ্কৃতি পাননি। রামের অনুপস্থিতিতে শোকগ্রস্ত দশরথ দেহত্যাগ করেন। অন্যদিকে মেঘনাদ পিতা রাবণকে রক্ষায় নিজে মৃত্যুবরণ করেন। আত্মত্যাগী হিসেবে তাহলে কে অধিক মহান? সিলির বিবেচনায়, অবশ্যই মেঘনাদ। মাইকেল মেঘনাদের ভেতরে তার নিজের সম্পূর্ণ বিপরীত এক পুত্রকে দেখেছেন। পিতার সঙ্গে মাইকেলের বিরোধের কথা আমরা জানি। পিতার কোনো কথাই তিনি শোনেননি, কোনো কথাই তিনি মানেননি। মেঘনাদ যেখানে পিতার আজ্ঞাবহ, কর্তব্যসমর্পিত সন্তান, মাইকেল সেখানে পিতার সকল নির্দেশ অবজ্ঞা করে গৃহত্যাগ করেছেন, ধর্মত্যাগ করেছেন, দেশত্যাগ করেছেন। আদর্শ পুত্র মেঘনাদের মৃত্যুতে মাইকেল স্পষ্টতই বিচলিত, শোকগ্রস্ত। সেই শোকের প্লাবনধারার ভেতর দিয়ে মাইকেল-যিনি নিজে 'এক ব্যর্থ মেঘনাদ', নিজের পিতার প্রতি তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে গেলেন।

মাইকেল তার এই কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন তার প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে। প্রচলিত বাংলা পয়ার অনুসরণ না করে মিলটনের মুক্ত ছন্দ বা ব্লাঙ্ক ভার্স অনুসরণে মাইকেল সে ছন্দ নির্মাণ করলেন। এতে পয়ারের চৌদ্দ মাত্রা অক্ষুণ্ন থাকলেও মিত্রাক্ষরের বদলে ছেদ ও যতির ব্যবহারের মাধ্যমে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাংলা কবিতাকে পুঁতি-পুরাণের কাঠামো ভেঙে তাকে আধুনিক তথা ইউরোপীয় মোড়কে স্থাপন করে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতার চরণ যে বাক্যের শেষে এসে থামতে হবে তা নয়, তা বাক্যের যেকোনো জায়গায়ই থামতে পারে, যদি সে যতি অর্থপূর্ণ হয়। অধ্যাপক সিলি অমিত্রাক্ষরে রচিত মেঘনাদবধ কাব্যগ্রন্থকে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে গিয়ে তার কাব্যধ্বনি অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে চৌদ্দ মাত্রার অমিত্রাক্ষর বাক্য নির্মাণ অনুসরণ করেছেন, কিন্তু মূলের গঠনগত কাঠামো ধরে রাখেননি। অন্য কথায়, অর্থান্তরিত বাণীকে অনুসরণ করে তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রথম চরণ থেকে দ্বিতীয় চরণে অনুগামী হতে দিয়েছেন। সিলি নিজেই বলেছেন, তার অনূদিত কবিতা মিলটনের আয়াম্বিক পেন্টামিটার অনুসরণ করেননি, বা তা মাইকেলের ধ্বনিনানুগও নয়। এর একটা কারণ, ইংরেজির মতো বাংলা সুনির্দিষ্ট স্বলসজ্ঞাত বা অ্যাকসেন্ট নেই।

সিলির অনুবাদ থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। *মেঘনাদবধকাব্যের* উদ্বোধন হচ্ছে এভাবে :

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী,
কোন বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিত মেঘনাদে-অজেয় জগতে-

উর্ম্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশংকিলা?

when in face-to-face combat Virbahu, crown-gem of warriors fell and went before his time to Yamas city- speak, O goddess of ambrosial speech- which best to warriors did the foe of Raghava, treasure-trove among that clan of Raksasas, designate commander, then send fresh to the battle? And by what stratagem did he, the joy of Urmila, destroy the hope of the Raksasas, Indras conqueror, that Meghanada-invincible throughout the world-and thus free Indra from his terror?

সন্দেহ নেই যে, মাইকেলের শব্দ-সংকোচ সিলি অর্জন করতে পারেননি, অনুবাদে তা সম্ভবও নয়। তার লক্ষ্য ছিল বাণী-সংকোচের প্রবণতা পরিহার করা। তার যতির ব্যবহার মোটের ওপর মূলানুগ হয়েছে। মাইকেল ঘন ঘন বিস্ময়বোধক চিহ্ন ব্যবহার করতেন, সিলি তার ব্যবহার কমিয়ে এনে আধুনিক পাঠকের জন্য পাঠাভিজ্ঞতা অধিক আনন্দবহ হতে সাহায্য করেছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ইংরেজ কবি উইলিয়াম রাদিচিও গত কয়েক বছর ধরে মেঘনাদবধ কাব্য ইংরেজিতে অনুবাদের কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। তিনি স্বরসজ্ঘাত অনুসরণের বদলে চৌদ্দ মাত্রা অক্ষুণ্ন রেখে ছেদ ও যতি ব্যবহারের বিরোধিতা করেছেন। তার যুক্তি, মাত্রাগুণে ইংরেজি ভাষায় কবিতা লেখা সম্ভব নয়, ইংরেজি কবিতা পূর্বনির্ধারিত মাত্রা-সিলেবল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না, কারণ ইংরেজি কবিতার পাঠক কবিতার মাত্রা শোনে না, সে শোনে স্বরসজ্ঘাত। মাইকেলের উপদেশ স্মরণ করে রাদিচি বলেছেন, পাঠকের উচ্চারণ তার কাব্যপাঠ নিয়ন্ত্রিত হয় যতি দ্বারা। সিলি তার অনুবাদে কোনো কোনো চরণ টু, অব, অ্যাজ ইত্যাদি শব্দ দিয়ে শেষ করেছেন, কিন্তু এসব শব্দ শেষে ইংরেজ পাঠক কখনো যতি দেবে না। সে কারণে বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করতে গেলে ভিন্ন পথে এগোতে হবে। অনুসরণের বদলে মাত্রা গুনতে গেলে মাইকেলের কবিতার ধ্বনিমাধুর্য অনর্জিত রয়ে যাবে।

রাদিচির যুক্তির জোর আছে হয়তো, কিন্তু সিলির হাতে *মেঘনাদবধের* যে অনুবাদ, তা একটি নিজস্ব ধ্বনিসুষমায় মণ্ডিত। আমরা জানি *মেঘনাদবধের* খটমট বাংলার জন্য অনেকে, এমনকি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তার সমালোচনা করেছেন। এই বাংলা খটমট হলেও তা ধ্বনিবৈচিত্র্যে ও কাব্যমাধুর্যে সমৃদ্ধ। *মেঘনাদবধ*কে যে আমরা মহাকাব্য বলি তার একটি অনুচ্চারিত কারণ সম্ভবত তার এই আপাত-জটিল ভাষা। মাইকেল যে তৎসম-শব্দ প্রধান কাব্যভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করেন, তা প্রায় দেড় শ বছরের পুরনো। মানতেই হবে তার একটি ক্লাসিক সৌন্দর্য রয়েছে। এই ভাষার আপাত-জটিলতা অতিক্রমে সক্ষম হলে *মেঘনাদবধের* কাব্যশক্তি আমাদের ঐন্দ্রজালিক মুগ্ধতায় আটকে ফেলতে বাধ্য। কিন্তু অধ্যাপক সিলি মাইকেলের ভাষাকে যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করেননি। *মেঘনাদবধকাব্য* অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি যে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করেছেন তা সাম্প্রতিক। মাইকেলের ভাষার ঐশ্বর্য্যে তিনি মুগ্ধ, কিন্তু আধুনিক পাঠকের চাহিদা মনে রেখে তার রূপান্তর করেছেন পরিমিত গাম্ভীর্যে। অন্য কথায়, *মেঘনাদবধ* পড়তে গিয়ে আমাদের বারবার অভিধানের সাহায্য নিতে হয়, কিন্তু *দি স্লেয়িং অব মেঘনাদ* পড়তে গিয়ে সে সমস্যায় পড়তে হয় না। উপরে উদ্ধৃত মাইকেলের কাব্যভাষা ও সিলি-কৃত ভাষান্তরটি লক্ষ করুন। প্রায় প্রতিটি শব্দ তিনি অক্ষুণ্ন রেখেছেন, যদিও যান্ত্রিক অর্থান্তর তার লক্ষ্য নয়, তার লক্ষ্য মাইকেলের ভাব ও ভাবনা পাঠকের কাছে অবিকৃতভাবে উপস্থিত করা।

মেঘনাদবধকাব্য ইংরেজিতে অনুবাদ শুধু কঠিন একটি কাজ নয়, প্রায় অসম্ভব একটি কাজ। সিলি সেই কাজটিই সম্পন্ন করেছেন অসাধারণ যোগ্যতা ও দায়িত্বসম্পন্নতার সঙ্গে। বাঙালি পাঠক হিসেবে তার উদ্দেশ্য জানাই অপরিসীম কৃতজ্ঞতা।

নিউইয়র্ক, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

দি স্লেইং অব মেঘনাদ (মেঘনাদবধকাব্য)

অনুবাদ : ক্লিনটন বি সিলি, অক্সফোর্ড ইউনির্ভাসিটি প্রেস, ২০০৪